গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩১ অক্টোবর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সরকার চায় মৃত্যুমিছিল চলুক, প্রতিবাদ মিছিল বন্ধ হোক

সরকারি হাসপাতালে একের পর এক মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রবল সমালোচনার সামনে পড়ে দারুণভাবে বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী অবশেষে এক বিরাট ধামার নীচে সমস্ত সমস্যা চাপা দিয়ে দিলেন। এটা তিনি করলেন এস এস কে এমের সুপার ও ডেপুটি সুপারকে সল্ট লেক ও রাইটার্সে, দু'জন ডাক্তারকে ট্রপিক্যাল ও বেলুড়ে বদলি করে এবং একজন কেরানিকে সাসপেণ্ড করে। বলা বাহুল্য, এই বদলি আদৌ শাস্তিমূলকও হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও 'মন্ত্রীসভার সম্পদ' সার্টিফিকেট দিয়ে দায়মুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। রাজ্যের সতেরটি জেলা এবং রাজধানী কলকাতার সমস্ত সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধেই যেখানে 'অবহেলা', 'গাফিলতি', 'অব্যবস্থা'র অভিযোগ — সেখানে একটি হাসপাতালের চার-পাঁচ জনকে 'অপরাধী' সাব্যস্ত করে 'শাস্তি' দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তৎপরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আসলে এর দ্বারা তাঁরা মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন।

তাঁরা আরও বলেছেন, হাসপাতালে ভর্তির বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে কমপিউটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। ঠিক এই কথা তাঁরা নয় মাস আগেও বলেছিলেন। এ ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তও হয়েছিল, যা তাঁরা কার্যকর করেননি। এখন সেই প্রতিশ্রুতিই আবার তাঁরা দিচ্ছেন। বি সি রায় শিশু হাসপাতালে অস্বাভাবিক শিশুমৃত্যুর পর চিকিৎসার উন্নতির জন্য সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও তারা রূপায়িত করেনি। হাসপাতাল নরকতুল্যই আছে। কেবল সেখানকার সুপার সরকারি অব্যবস্থা ও অবহেলার কথা বলেছিলেন বলে তাঁকে বদলি করা হয়েছে। কারণ সরকার খুব অসুবিধায় পড়ে গেলে ব্যক্তিগতভাবে দু'চারজনকে দায়ী করে সরকারি অবহেলা চাপা দিয়ে নিজেদের অপরাধ জনগণের অগোচরে রাখতে চায়। তাই এবার এত কাণ্ডের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে হাসপাতালে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছেন। এ থেকেই বোঝা যায় সমস্যা সমাধানে সরকার আদৌ আগ্রহী নয়।

হাসপাতালের রোগ বহুমুখী। দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিত সরকারি অবহেলা; শাসকদলের চূড়ান্ত দলবাজি, তাদের আশ্রিত প্রশাসক, একশ্রেণীর চিকিৎসক ও কর্মচারীর বেপরোয়া আচরণ, চরম দুর্নীতি; ওষুধ, সরঞ্জাম, পরিকাঠামোর দারুণ অভাব, বিপুল পরিমাণ রোগীর চাপ — সবটা মিলে হাসপাতালগুলি নরকতুল্য হয়েছে। এক একটা মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের পর সরকার যেসব

চারের পাতায় দেখুন

হাসপাতাল পরিষেবার আমূল পরিবর্তন চাই

হাসপাতালের বেহাল অবস্থার সংবাদ যাতে বাইরে না আসে তার জন্য সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের এবং নিষ্ঠুর অবহেলায় মৃতদের আত্মীয়-বন্ধুরা ও অন্য সংগঠনগুলি যাতে প্রতিবাদ জানাতে না পারে তার জন্য, হাসপাতালে প্রাক্তন সেনানী ও পুলিশ নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন —

"প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হয়ে রাজ্য সরকার হাসপাতাল সম্পর্কে যে ব্যবস্থাগুলি ঘোষণা করেছে তা কিছু লোকদেখানো ব্যবস্থা মাত্র। আমরা দাবি করছি —

১। ডাক্তার-নার্স-প্যারা মেডিকেল স্টাফ নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে দলীয় আনুগত্য নয় — পেশাগত যোগ্যতা ও রোগীদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে মাপকাঠি করতে হবে।

২। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমানোর সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করে অধিক বরাদ্দ করতে হবে।

৩। বর্ধিত চার্জ বাতিল করে হাসপাতালগুলিকে বাণিজ্যিক করার স্কীম অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। হাসপাতালগুলিতে সরকারি দলপুষ্ট দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে।

৬। মূলত ভলাণ্টারি ডোনারদের থেকে সংগৃহীত রক্তের অত্যধিক দাম বাড়িয়ে ব্যবসা করা বন্ধ করতে হবে।

৭। বিশিষ্ট চিকিৎসকদের, স্বাস্থ্য পরিষেবার কর্মীদের সংগঠনগুলির এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে হাসপাতাল পরিষেবার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

বিচারপতির বিরুদ্ধে সি পি এমের তর্জন-গর্জন শেষ

বিচারপতি অমিতাভ লালার বিরুদ্ধে সি পি এম-এর তর্জন-গর্জন শেষ। তাদের সরকারই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে, কলকাতা শহরে মিটিং-মিছিল সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। কোন্ রাস্তায়, কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তারও পুরো নক্শা তৈরি করে সংবাদপত্রে প্রকাশও করে দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ২৯ অক্টোবর সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, বিরোধী দলগুলিকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নেওয়া। তাহলেই বলা যাবে, একতরফা সরকারি হুকুমনামা নয়, সকল রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়েই 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এ ব্যাপারে অন্যান্য পরিষদীয় দলগুলির সম্মতি পেতেও যে খুব অসুবিধা হবে না, তা ইতিমধ্যে তাদের বক্তব্যেও পরিষ্কার।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নামে বাগাড়ম্বর যতই করা হোক্ একথা পরিষ্কার যে, এ রাজ্যে কংগ্রেস যে কাজ করতে পারেনি, সেই মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার মূল পরিকল্পনাটি সি পি এম সরকারেরই এবং তা কার্যকর করার জন্য সি পি এম দল ও সরকারই সবচেয়ে বেশি ব্যগ্র। এ ব্যাপারে দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকরা ও তাদেরই স্বার্থরক্ষায় তৎপর সংবাদমাধ্যম সরকারকে একটা লাগসই অজুহাতের যোগান দিয়েছে, তাহল, 'জনমত'। সরকারের ভাবখানা হল, 'জনমত যখন মিটিং-মিছিলের উপর 'নিয়ন্ত্রণ'-এর পক্ষে তখন সরকারের উচিত তা নিয়ন্ত্রণ করা।' জনগণের মতামতের প্রতি সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের এমন গদগদ ভক্তি, অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখা তো যায়ই না, বরং জনমতকে কীভাবে হেলায় উপেক্ষা করতে হয়, প্রশাসন ও দলীয় শক্তির দাপটে কীভাবে জনমতকে গুঁড়িয়ে দিতে হয়, তার অসংখ্য নজির এই সরকার ২৬ বছরের শাসনে সৃষ্টি করেছে। এখন মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে জনমতের প্রতি ভক্তি দেখানো বাস্তবে নিকৃষ্ট ভণ্ডামি। এতে বিভ্রান্ত হলে রাজ্যের জনগণ আবার ঠকবেন।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিলে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার অঙ্গীকার করে এসেছে যে, শহরে মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার নিজেই একটা আইন করবে। বিচারপতি লালা তো তার রায়ে কার্যত এটাই চেয়েছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি পরিকল্পনার নক্শা সঠিক হলে, সরকার যেখানে যেখানে নিয়ন্ত্রণ-এর কথা বলছে, সময় বেঁধে দেওয়ার কথাও ভাবছে, বিচারপতির ভাবনার সাথেই তার অদ্ভুত মিল। অর্থাৎ হাইকোর্টের রায়ের মর্মবস্তুকে

আটের পাতায় দেখুন

"ইরাক থেকে মার্কিন সেনা ফিরিয়ে আনো" এই দাবিতে ২৫ অক্টোবর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিল করে।

বিপুল উদ্দীপনায় ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

সকল বেকারের কাজ, জেলায় শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপনের দাবিতে, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে ১৮ ও ১৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ডি ওয়াই ও'র ৫ম মুর্শিদাবাদ জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

১৮ অক্টোবর বহরমপুর গ্রাণ্ট হল মাঠে দুই হাজারেরও বেশি যুবকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভা পরিচালনা করেন ডি ওয়াই ও'র জেলা সভাপতি কমরেড আবুল ফজল।

সুসজ্জিত প্রকাশ্য সভায় সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরি। বক্তারা সকলেই গণআন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড মোসাব্বর হোসেন। সাম্প্রতিক হাইকোর্টের রায়ে মিটিং-মিছিল বন্ধের নির্দেশের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামশুল আলম। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র জেলা সম্পাকমণ্ডলীর সদস্য, যুবনেতা কমরেড কৌশিক চ্যাটার্জী। সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপন করে সকল বেকার যুবকের কাজকে সুনিশ্চিত করতে হলে রাজ্যজুড়ে চাই দুর্বার যুব আন্দোলন। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার দেশি মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে পঙ্গু করতে চাইছে, এর প্রতিবাদে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু সমস্ত যুবককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহবান জানান। প্রকাশ্য সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, যৌবনের ধর্মই হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' আর এইজন্যই সারা জীবন নজরুল-শরৎচন্দ্র যৌবনের পূজারী ছিলেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জ ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ও ১৯ অক্টোবর দুই বেলা তিন শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিনিধি সম্মেলন খাগড়ার সি টি আই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেডস্ সামশুল আলমকে সম্পাদক ও কৌশিক চ্যাটার্জীকে সভাপতি করে ২৫ জনের জেলা কমিটি ও ৪০ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে যুবক-যুবতীদের একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

গ্রাণ্ট হল মাঠে প্রকাশ্য যুবসমাবেশের একাংশ

রায়দীঘিতে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘিতে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে গত ১৯ অক্টোবর রায়দীঘি বাসস্ট্যাণ্ডে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রায়দীঘি হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি রেণুপদ হালদার। রায়দীঘি থেকে ময়রার মহল পর্যন্ত বাসরাস্তা থেকে ১৫০ ফুটের মধ্যে সমস্ত হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয় মানুষ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন যে, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে ডি এম, এস ডি ও, বি ডি ও, এস ডি পি ও এবং পি ডব্লু ডি অফিসারদের এক গোপন বৈঠকেই নাকি ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থায়ী পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদের এই অমানবিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা লাগাতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছে রায়দীঘি রিক্সাভ্যানচালক ইউনিয়ন, মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন, রাইস মেকার ভান্‌কি অ্যাসোসিয়েশন, সুন্দরবন মোটরবোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, সুন্দরবন মৎস্যজীবী সংগঠন, ভেণ্ডার অ্যাসোসিয়েশেন সহ বহু সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস

গত ১৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ডি ই-পার্ট ওয়ানের বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ঐদিনই দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। অতীতেও বার বার নানা ধরনের দুর্নীতির ঘটনা এখানে ঘটেছে। দোষীদের শাস্তি, নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণ ও দুর্নীতি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থার দাবিতে ডি এস ও-র মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রার দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা বাতিলের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় দুর্নীতি, পরীক্ষা সংক্রান্ত অরাজকতা প্রভৃতি নিয়ে ডি এস ও জেলা কমিটি ইতিপূর্বে ডেপুটেশন, ঘেরাও, জেলাজুড়ে ছাত্রবিক্ষোভ প্রভৃতি কর্মসূচী পালন করেছে। সংগঠনসূত্রের খবর, এ নিয়ে তারা আগামী জানুয়ারি মাসে এলাকাভিত্তিক ও জেলা কনভেনশনের আয়োজন করবে।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

গত ১৯ অক্টোবর বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউটে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণার চতুর্থ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বর্তমান সমাজে নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, বধূহত্যা, অপসংস্কৃতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী গণআন্দোলনের আহবান জানিয়ে কুড়ি দফা দাবি সহ মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের মূল বক্তা সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা, বিশিষ্ট নেত্রী কমরেড শ্যামলী মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জেলায় দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিধিদের কাছে আহবান জানান। কমরেড ইন্দ্রাণী হালদারকে সভানেত্রী ও কমরেড শিবানী হালদারকে সম্পাদিকা করে নূতন জেলা কমিটি ও তৎসহ জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

'গোধরার অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে'

গত বছর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী যখন গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে গুজরাটে তাণ্ডব চালাচ্ছিল, তখন বিজেপি সাফাই দিয়ে বলেছিল যে, এসবই ঘটছে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের ৬নং কোচে ৫৮ জন করসেবকের জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। যারা মারা গিয়েছিল, তাদেরকে 'হিন্দুত্ব রক্ষায় শহীদ' বলে তুলে ধরা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে উস্কানি দিতে ঐ মৃতদেহগুলি গ্রাম-শহরে ঘোরানো হয়েছিল। এবং মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে মৃতদের ছাই নিয়ে 'যাত্রা' পর্যন্ত সংগঠিত করেছিলেন। এরপর কী ভয়াবহ গণহত্যা চালানো হয়েছিল, তা সকলেরই জানা। এই গণহত্যার সময় বা পরবর্তীকালে বিজেপি সরকারের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা নিয়ে যখনই প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বিজেপি কোণঠাসা হয়েছে, তখনই তারা গোধরায় মৃতদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তার আড়াল নিয়েছে। মোদি সকল সমালোচনা ও অভিযোগকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, এ ব্যাপারে সরকারের কিছু করার নেই। এ যুক্তি তুলে তিনি সরকারের ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও পালন করেননি। কিছুদিন আগে আর এস এস-এর এক সভায় তাদের সর্বোচ্চ নেতা কে এস সুদর্শন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে বলেছেন 'হিন্দুবিরোধী', কারণ, বেস্ট বেকারি মামলাকে কমিশন সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গেছে।

কিন্তু এখন সেই গোধরায় মৃত করসেবকদের আত্মীয়স্বজনরাই গুজরাটের আইনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছেন। এখন বিজেপি কি বলবে? বজরং দল ও ভি এইচ পি কর্মীদের আত্মীয়স্বজনরাও কি হিন্দু বিরোধী? এদের অভিযোগ খুবই গুরুতর। এদের অনেকেই ক্ষতিপূরণের টাকা পায়নি। নানাবতী কমিশনে যাতে কেউ সাক্ষ্য না দেয়, বরং সাক্ষী হিসাবে যাদের নাম আছে, তারা হাজির না হয়ে যাতে সংঘ পরিবারের কেউ নাম ভাঁড়িয়ে সাক্ষী সেজে যেতে পারে — তার জন্য হুমকি দেওয়া চলছে। করসেবকদের পরিজনরাই চাইছে, মামলা গুজরাটে না হয়ে বাইরে অন্য কোনও রাজ্যে হোক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ১৫ অক্টোবর ঘটেছে। গোধরায় ট্রেনের আগুনে নিহত হয়েছেন এমন চারজন মহিলার আত্মীয়রা সুপ্রিম কোর্টে একটি দরখাস্ত দিয়ে দাবি করেছেন যে, ভি এইচ পি'র অযোধ্যা যাত্রা বন্ধ করা হোক এবং গুজরাট ধ্বংসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। মূল পিটিশনের সাথে যুক্ত করে যে এফিডেভিট জমা দেওয়া হয়েছে, তাতে ৮২ বছরের প্রবীণ গিরিশভাই রাওয়াল সংঘ পরিবারকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন। এই মানুষটি তাঁর স্ত্রী সুধাবেনকে গোধরা অগ্নিকাণ্ডে হারিয়েছেন। তারপরও তিনি বলেছেন — "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের রাজনৈতিক খেলায় গোধরা অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের বলির পাঁঠা করেছে।" তিনি আরও বলেছেন, গোধরা ঘটনাকে অজুহাত করে ভি এইচ পি এবং বিজেপি কোটি কোটি টাকা তুলেছে। শুধু গুজরাটে নয়, দেশের সর্বত্র। ঐ টাকা ব্যবহার করে গত নির্বাচনে তারা গুজরাটে জয়ীও হয়েছে। আদালতে আবেদনে রাওয়াল বলেছেন — ঐ টাকার তদন্ত হোক, ঐ টাকা কোথায় গেল? কী কাজে খরচ করা হল?

গিরিশ ভাইয়ের স্ত্রী শুধু নয়, সন্তানও নিহত হয়েছে গুজরাট দাঙ্গায়। তিনি বলেছেন, তাঁর পুত্র অশ্বিনীভাই ছিল বজরং দলের একজন নেতা। দাঙ্গার সময় সে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হয়েছে। এজন্য তিনি দায়ী করেছেন গুজরাট পুলিশ ও ভি এইচ পিকেই। তিনি বলেছেন, "যেকোন একজন সন্ত্রাসবাদীর মতোই আমার ছেলেও, ভি এইচ পি'র বিষাক্ত প্রচারে প্রভাবিত হয়ে মনেপ্রাণে পাল্টে যায়। আমার ছেলে ভি এইচ পি'তে যোগ দেওয়ায় এবং তাদের জঘন্য প্রচারের শিকার হয়ে যাওয়ায় একজন পিতা হিসাবে যে দুঃখ পেয়েছি, কষ্ট ভোগ করেছি, তার ফলে আমি আন্তরিকভাবে মনে করি, 'অযোধ্যা যাত্রা'র মতো এ ধরনের সমস্তরকম যাত্রার কর্মসূচি যা হিংসাকে হাতিয়ার করে ও হিংসা ছড়ায়, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ করা দরকার।" রাওয়াল বলেন, "আমরা ন্যায়বিচার ও মর্যাদা চাই। গোধরার মর্মান্তিক ঘটনাকে দৃষ্টান্ত করে আমরা দেশের মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে, এই ধরনের যাত্রা-পলিটিক্স থেকে তাঁরা যেন দূরে থাকেন।"

রাওয়াল আরও জানিয়েছেন যে, তিনি এবং অন্যান্য নিহতদের আত্মীয়রা নানাবতী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কী বলবেন, সেটাও ভি এইচ পি নেতারা ঠিক করে দিতে চেয়েছিল এবং "নীরব" থাকলে ৫০ হাজার টাকাও দেবে বলেছিল। রাওয়াল নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের নিরাপত্তা চেয়ে কোর্টে আবেদন করেছেন।

(সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ১০-১০-০৩, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-০৩)

মিটিং-মিছিলের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা আন্দোলন করব

— কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যাল

(মিটি)-মিছিলের উপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর এস ইউ সি আই আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যালের বক্তব্য প্রকাশ করা হল।ং

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সভায় উপস্থিত বন্ধুগণ,

আমি বক্তব্য খুব অল্প কথাতেই বলব। প্রথমে বলি, মানিক মুখোপাধ্যায় উপস্থাপিত যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, যার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ প্রভাসবাবু করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। আমি একজন বঙ্গবাসী। বাঙালি ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে বিশ্বম্ভর মিশ্র কাজীর নির্দেশকে অমান্য করার জন্য বিশাল শোভাযাত্রা করেছিলেন, ইতিহাসে যেটা চৈতন্যদেবের 'কাজী দলন' নামে খ্যাত হয়ে আছে। দীর্ঘ ইতিহাসের কথা বাদ দিই। ১৯০৫ সালে এখানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশপ্রেমী মানুষদের বহু মিছিল হয়েছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্বে থেকে বিখ্যাত রাখীবন্ধনের উৎসবের জন্য শোভাযাত্রা করেছিলেন। কলকাতা শহরে এইরকম শোভাযাত্রার ইতিহাস আরো অনেক আছে। যেমন যতীন দাস যখন শহীদ হয়েছিলেন, কলকাতা শহরে বৃহত্তম শোভাযাত্রা হয়েছিল। সবাই বলে, কালিঘাট থেকে একদম উত্তরে সে শোভাযাত্রা এসেছিল এবং নিঃশব্দে কয়েক লক্ষ মানুষ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এতবড় শোভাযাত্রা তার আগে কলকাতায় হয়নি। তার মানে যাঁরা মিছিলের রাজনীতি করেন, তাঁরা আদতে রাজনীতির এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির চর্চা করেন এবং বিস্তৃত সংস্কৃতির পরিবেশের ভিতর রাজনীতিও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটা বলতে পারি, বঙ্গদেশের একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস আছে, যা রাজনীতির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবকল্যাণের জন্য অভিষিক্ত হয়ে বড় বড় মিছিল করেছে। কোন ব্যক্তি এই মিছিলকে বাতিল করে দেবে, আমি বাঙালি হিসাবে আইন ভাঙা হবে বলে, তা স্বীকার করে নিতে পারি না।

প্রথমে একটা কথা বলে রাখি। আমি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, অথবা খাদ্য আন্দোলনের সময়, বা কেরালা সরকার ভেঙে দেওয়ার সময়, অথবা নানা সময় যে বড় বড় মিছিল হয়েছে সেসব কথা বলছি না। আমি একটা সঙ্কটের কথা বলছি। আমাদের দেশে যখন সংবিধান রচিত হয়েছিল তার যে ড্রাফটিং কমিটি ছিল, তার ভিতরে আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দ খুব একটা ছিলেন না। ছিলেন বড় বড় আইনজ্ঞ ও আইন বিশারদরা। অথচ অন্যান্য দেশে যখন সংবিধান সৃষ্টি হয়েছে — সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক, ফ্রান্স হোক, রুশ দেশ হোক — প্রত্যেকটি দেশে বিপ্লবের সঙ্গে, আন্দোলনের সঙ্গে, সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত যে মানুষ, তাঁরাই কী ধরনের রাষ্ট্র হবে, নিয়মকানুন হবে, সে সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু একটা বিশেষ শক্তির কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার ফলে ভারতবর্ষে যে সংবিধান, ১৯৩৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট সংবিধানের সঙ্গে পরম্পরাভিত্তিকভাবে রচিত হয়েছে, তাতো সত্যি সত্যি মানুষের তাবৎ অধিকারকে যোগ্যভাবে স্বীকার করে না। ফলে আমাদের দেশে যে কোন সময় যে কোন বিচারক উদ্ভট কিছু কথা বলেও ফেলতে পারেন, যেটা আমেরিকা বা ব্রিটেনে বা ফ্রান্সে বা রাশিয়াতে সম্ভব নয়। আমি শুধু সংবিধান নিয়ে এই কথা বলছি, এসব কনটেম্পট অব কোর্টের বিষয় নয়। এখন আমি যে কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে, মিছিলে আমার গাড়ি আটকেছে, আমার খুব অসুবিধা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। যাবার পর আমি অভিযোগ করলাম। আমিই একজন উকিল হিসেবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলাম। আবার বিচারক হিসাবে চেয়ারে বসে তার বিচারও আমিই করলাম। অভিযোগের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে সাক্ষীও সেই আমি। এর নাম সুয়োমোটো বিচার। বঙ্গদেশের ৮ কোটি মানুষের কাছে এটা কি গ্রাহ্য হবে? হওয়া উচিত কি? আইন অনুযায়ী কি এটা করা যেতে পারে? আমার চেয়ে যথেষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ যে বিচারক এই রায় দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাঁর পরিবার আছে, তিনি সবকিছুর ভেতরে আছেন। কিন্তু তাঁর যদি সাধারণ মানুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন — যিনি আক্রান্ত মনে করছেন তিনি অভিযোগ করছেন, তিনি তার ব্যাখ্যা করছেন এবং তিনিই বিচার করছেন — এটা ভাবলেই মানুষ হেসে উঠবেন। কিন্তু তাও হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে। কেন হয়? কথাটা সহজ সরলভাবে আমি বললুম বটে, কিন্তু বিষয়টা অতটা সহজ না। একটা প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে প্রশাসনবিভাগ থাকে, আইন রচনাবিভাগ থাকে, আর বিচারবিভাগ থাকে। অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ, লেজিস্‌লেটিভ এবং জুডিশিয়ারি। একে বলা হয় ক্ষমতার বিভাজন (সেপারেশন অব পাওয়ার)। কিন্তু কোন দেশে যখন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা দেয়, যখন আন্তর্জাতিকভাবে ভয়ঙ্কর সঙ্কটাচ্ছন্ন শক্তি সেই রাষ্ট্রীয় শক্তিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে গিয়ে আরো সঙ্কটাচ্ছন্ন করে দেয়, তখন এমন উদ্ভট ঘটনাই দেখা যায়। আমাদের দেশে কেন্দ্র থেকে রাজ্য পর্যন্ত যে প্রশাসনিক শক্তি যাকে এক্সিকিউটিভ বলে। তাদের সততা বিষয়ে যদি বলা হয় যে, তারা খুব সৎ, আমরা হাসব। আমরা দেখব, আদতে সেখানে সমস্ত জায়গায় বিপুল পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি ও কুকীর্তি রয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় রাজধর্ম পালন করেন নরেন্দ্র মোদি, সেটা কেমন তা আমরা জানি। এই হল প্রশাসনের অবস্থা।

দ্বিতীয়ত, আইনসভার কথা বলাই উচিত না। এখনই ইউ পি-তে বসে আছেন একজন আইনসভার সদস্য, যিনি আইনপ্রণয়নকারী বটেন এবং মন্ত্রীও বটেন। তিনি তাঁর এক প্রেমিকাকে খুন করে এখন জেল হাজতে। এই হচ্ছে ক্রিমিনালাইজেশন। এমন জাতের সদস্য লোকসভা থেকে শুরু করে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভাগুলিতে অনেক পাওয়া যাবে। এই দু'টি বিভাগ যখন এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছেছে যেটা মানুষ জেনে ফেলেছে, তখন ভারতের শাসক পুঁজিপতিরা শেষপর্যন্ত টিকে থাকার জন্য চেষ্টা করছে এই বলে যে, দেখ বিচারবিভাগ তো ভীষণরকম পরিচ্ছন্ন রয়েছে। আইন, বিচারবিভাগ কখনও ভুল করে না, এটা তোমরা মান। তামিলনাড়ুতে আদালত যে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ বলে রায় দিল — সেটা মেনে নাও। আবার সংবাদপত্রে দেখলাম, গুজরাট সরকার হাইকোর্টে যে হলফনামা পেশ করেছে, তার সত্যতা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেশে ঘটছে। এর বিরুদ্ধে দেশের কোটি কোটি মানুষ প্রতিবাদ করবে না? এতেও যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে বলা যাবে না, "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।" না, আমরা মেষ নই। আমরা প্রতিবাদ করব এবং প্রতিবাদ করতে এসেছি বলে এই সভাতে এই প্রস্তাবটা নিচ্ছি — কলকাতা শহরের ঐতিহ্য অনুযায়ী, মহানগরীর ঐতিহ্য অনুযায়ী, মিছিল-মিটিং করবার জন্য আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার ১৯ ধারায় ১নং-এ আছে, আমরা তা উদ্‌যাপন করবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হব এবং তার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করব।

আজ সকালে বর্ধমান থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে মোটর সাইকেল ঘুরছে শত শত-হাজার হাজার এবং নানাধরনের পণ্যসামগ্রী গ্রামে-পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি হচ্ছে। এই বিক্রি হচ্ছে কোত্থেকে, তৈরিই বা হচ্ছে কোথায় — তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন। দেখা গেল, এক একটা মোটর সাইকেল, বা কিছু জিনিষ যা মানুষ ভোগ করছে, এর কোনটাই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়নি। কিন্তু তারও বিপণনের কেন্দ্র হল এসপ্ল্যানেড এলাকা — যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গোটা পশ্চিমবাংলায় এই ব্যবসাটা চলছে। এবং এই ব্যবসাটা যারা চালাচ্ছে তারা যে কারণেই হোক কলকাতা শহরের ৬০ ভাগ মানুষ হয়ে গেছে। আমরা ৪০ ভাগ মানুষ। ফলে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য আমরা যা বজায় রাখতে চাই, আমরা সে অধিকার থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছি। অধিকার রয়েছে তাদের, যারা এই ব্যবসা কেন্দ্রগুলি চালাচ্ছে। তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য মিটিং-মিছিল চলবে না। অঙ্কটা একটু কঠিন হয়ে যায় যদি দৃষ্টিকে আরও একটু বাড়িয়ে নিই। পশ্চিমবঙ্গে বাজেট ঘাটতি রয়েছে, এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্য ব্রিটিশ পুঁজি ঢোকানো হবে। এ যদি আমরা মেনে নিই, যদি মনে করি এটা একটা স্বাধীন দেশের স্বাভাবিক বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও মেনে নেব যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য 'পুঁজি চাই, পুঁজি চাই' করে আমরা যখন হেদিয়ে মরছি, তখন পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ উৎপাদিত সম্পদ, কৃষি ইত্যাদি প্রতিদিন প্রতিবছর মাঝখানে একটু ধাক্কা দিয়ে কোরিয়ায়, আমেরিকায়, ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, পশ্চিম জার্মানিতে আমরা যে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেটাও স্বাভাবিক। দেশীয় ও বিদেশী পুঁজি মিলে পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত একটা বিকৃত বিকলাঙ্গ বাণিজ্যিক অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। এই বাণিজ্যিক অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার জন্য আমাদের এখানে দায়বদ্ধ থাকছে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এবং এখানকার সরকার। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমাদের দুঃখ এবং কষ্টটা হল এই যে, ক'দিন আগেই যারা আমাদের আপনজন ছিল, আজ দেখছি তাঁরা যখন অবস্থাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইছে না, পারছে না, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করছে না, তখন বোঝার প্রয়োজন রয়েছে আমরা ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছেছি।

সর্বশেষে বলি, আমরা যখন দেখি — ইস্কুলে পড়বে, তার জন্য প্রচুর বেতন দিতে হবে; শিক্ষকরা ১০০০/২০০০ টাকা মাইনেতে কাজ পাবেন এবং এক বছরের সীমাবদ্ধ সময় তাঁরা কাজ করবেন, কর্তৃপক্ষ যদি খুশি হন তবে তাঁদের রাখবেন, না হয় রাখবেন না। যখন দেখি, ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হতে হবে, তার জন্য মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে কেন্দ্রের কাছে, তখন আমাদের তো প্রতিবাদ করতে হবে। যখন চাষীরা আলুর, গমের, ধানের ন্যায্য দাম পাবেনা, মিছিল করে চাষিরা কলকাতায় আসবে। নানা ধরনের আক্রমণের প্রতিবাদে ছাত্ররা যখন মিছিল করে কলকাতায় আসবে, শ্রমিক-কর্মচারীরা যখন আসবে, নানা অংশের মানুষ যখন আসবে, তখন এই আইন অনুযায়ী বলা হবে — তোমাদের মিছিল-মিটিং করার অধিকার নেই। আমরা বলছি, এ অধিকার আমাদের আছে। আমাদের সংবিধান যতই বিকলাঙ্গ-বিকৃত হোক, তাতে এখনও পর্যন্ত ছয়টি অধিকার দেওয়া আছে। তার ভেতর একটা আছে মিটিং-মিছিলের অধিকার, মতবাদ প্রকাশের অধিকার, সভা-সমিতি করার অধিকার। এ অধিকার আমরা ছাড়ব না। মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য চেষ্টা করে, আত্মোপলব্ধির জন্য সংগ্রাম করে, সে তার নিজস্ব শ্রেণীর উপযুক্ত বিকাশের জন্য সংগ্রাম করে, আন্দোলন করে, তাহলে তার একটিই পথ খোলা থাকে — অজস্র মানুষের সমাবেশ তৈরি করা, অজস্র মানুষের শোভাযাত্রা তৈরি করা।

শোভাযাত্রার ভেতর দিয়ে মানুষকে ভীষণরকমভাবে বিপর্যস্ত করা হয়? হ্যাঁ, হয়। আমি তো হার্টের রোগী। কিছুদিন আগে আমি খুব অসুস্থ হই, বুকে ব্যথা। বাগুইহাটিতে থাকি। আমি আসছি হাসপাতালে, ডাক্তারবাবুর কাছে। আমাকে নিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ বাঁশ বেঁধে রাস্তা আটকানো হয়েছিল — রাষ্ট্রপতি যাচ্ছেন। এমনি কলকাতা শহরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাম-শ্যাম-যদু-মধু, স্বদেশি-বিদেশি — এদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা আটকানো হবে, মানুষের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা হবে, তখন সেটা বেআইনি নয়। কিন্তু আমি যদি সভা করি, আপনাদের সহযোগিতায় শোভাযাত্রা করি, তখন বলা হবে তা বেআইনি। আমি যখন তার বিরুদ্ধে কথা বলব তখন বলা হবে, আদালতের অবমাননা করা হচ্ছে। আমি আদালত

পাঁচের পাতায় দেখুন

মজুত খাদ্য কোথায় গেল

এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আসল রূপ। লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য গুদামজাত — পচে যাবে, চুরি হয়ে যাবে, অথবা জলের দরে বিদেশে চলে যাবে। অথচ শিশুসহ কোটি কোটি মানুষ অনাহারে থাকবে। অভুক্ত অনাহারক্লিষ্টরা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অসুস্থ হবে। নিশ্চিত মৃত্যু হবে তাদের শেষ আশ্রয়।

বছর দুয়েক আগে ওড়িশায়, গত বছর রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে এমন ঘটনাই ঘটেছে। ঐসব প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ কোথাও আমের শাঁসের মণ্ড, কোথাও গাছের পাতা, কোথাও ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেও পারেনি। শয়ে শয়ে মরেছে, পঙ্গু হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি গুদামে তখন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোকে তা দেওয়া হয়নি। এ অবস্থা ঐ প্রদেশগুলোতে তীব্র হলেও এরকম ঘটনা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই ঘটছে। খাদ্যের বিশাল মজুতভাণ্ডার অভুক্ত মানুষের কোন সাহায্যেই আসেনি। প্রশ্ন হল, এই বিপুল খাদ্যশস্য কি হয় বা কোথায় যায়?

এ সম্পর্কে সম্প্রতি কিছু খবর বেরিয়েছে, যা ভয়ঙ্কর, যা লজ্জাজনক। গত বছর এদেশে মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন। কিলো প্রতি দু'টাকা হিসাবে গত আর্থিক বছরে এর জন্য গুদাম ভাড়াই দিতে হয়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। দেশে আপৎকালীন সঞ্চয় (বাফার স্টক) প্রয়োজন ১.৬ কোটি টন থেকে ২.৪ কোটি টন। অর্থাৎ মোট খাদ্য মজুতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।

সরকারের দাবি, এই মজুত খাদ্য থেকে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পে ১ কোটি টন এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার (রেশন) মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে ১.৮ কোটি টন। যদিও এই হিসাব কতখানি সত্য সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত এদেশের চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক আমলাদের যোগসাজশে কোন সরকারি সাহায্যই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত বা অভাবীদের কাছে পৌঁছায় না, মাঝপথেই বেশিরভাগ লুঠ হয়ে যায়। তবুও যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য আংশিক হলেও দরিদ্র মানুষদের দেওয়া হয়েছিল, তা হলেও অতিরিক্ত প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে মজুত ছিল। তার কোন সদ্ব্যবহার করা হয়নি। অথচ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই পরিমাণ খাদ্যশস্য যদি সত্যি সত্যি সরকারি হিসাবেই দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা কোটি কোটি অভুক্ত মানুষকে কিছু 'কাজের বিনিময়ে' দেওয়া হত, তাহলে যেমন সমাজে কিছু কাজ সৃষ্টি হত, তেমনি অভুক্ত মানুষগুলো অপ্রতুল হলেও কিছুটা আহার জোটাতে পারত। কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতেই সদা তৎপর সব বুর্জোয়া দলের মতই বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারও সেদিকে কোন সদর্থক পদক্ষেপই নেয়নি। নামকাওয়াস্তে লোকদেখানো সামান্য কিছু পরিমাণ চাল-গম গরিবদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেশির ভাগটাই হয় মুনাফার পণ্য হিসাবে দেশের ব্যবসায়ীদের পকেট বোঝাই হতে বিলিয়ে দিয়েছে, নয়ত চুরি-দুর্নীতি করতে সাহায্য করেছে। তাই দেখা গেল, এ বছরের আগস্ট মাসের গোড়াতে এফ সি আই-এর সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের মজুত মাত্র ৩ কোটি টনে নেমে এল।

অর্থাৎ এক বছর আগের মোট মজুতের (৬.৫০ কোটি টন) প্রায় অর্ধেকের বেশি কমে গেল। শুধু কি তাই? গত সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এই পরিমাণ মজুতও আরো কমে দাঁড়াল ২ কোটি ২০ লক্ষ টনে। এর মধ্যে চালের মোট মজুত বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৫০ লক্ষ টনে, যা আপৎকালীন প্রয়োজনীয় মজুত (বাফার স্টক) ৮০ লক্ষ টনেরও কম। কিন্তু এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই বিশাল মজুত ভাণ্ডারের এমন ব্যাপক ক্ষয়ের কারণ কি?

বাস্তবিকপক্ষে, চূড়ান্ত জনবিরোধী একটি সরকারের নিকৃষ্ট জনবিরোধী কার্যকলাপের এটা একটা ঘৃণ্য নিদর্শন। ঘটনা হল, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের আশ্রিত রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের দেড় কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য প্রায় বিলিয়ে দিয়েছে, রপ্তানির নামে নামমাত্র দামে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। রপ্তানি করতে সরকার এত বেশি ভর্তুকি দিয়েছে যে, রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের দাম, এমনকি দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা গরিবদের যে দামে দেওয়া হয়, তার থেকেও কম। এভাবে রপ্তানি ভর্তুকি দেওয়া যাবে না বলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লু টি ও) যখন আপত্তি তুলল, সরকার চালাকি করে খাদ্যশস্যের ঐ ভর্তুকিকে খাদ্যশস্য পরিবহণে ভর্তুকি হিসাবে দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ রপ্তানি ও ভর্তুকি দুই-ই বহাল থাকে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। দেশের মানুষকে না খাইয়েও ব্যবসায়ীদের পকেট ভর্তি করা।

এই অন্যায় অযৌক্তিক রপ্তানি থেকে যে বিরাট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হল, সেটারও কিন্তু যথাযথ ব্যবহার হল না। কোনও জনকল্যাণমূলক খাতে তা বরাদ্দ করা হল না। এই আয় যোগ হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতভাণ্ডারে সঞ্চয় হিসাবে। গত বছর যেখানে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা, এক বছরে সেই বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রায় ৯৯ হাজার কোটি বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকার এই 'সাফল্যে' উল্লসিত, যদিও দরিদ্র জনসাধারণের এতে কোন উপকারই হল না।

এখানেই শেষ নয়। দেখা যাচ্ছে, মজুত খাদ্যশস্যের মধ্যে ৩০ লক্ষ টনের কোন হিসাবই নেই — হয় চুরি হয়েছে, অথবা যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাবা যায়! যখন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে মরছে, তখন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য রপ্তানির নামে বিদেশে পাচার হচ্ছে, বা স্রেফ উধাও হয়ে যাচ্ছে, বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যণীয়, এই রপ্তানির অজুহাত হিসাবে আমদানি করা হচ্ছে 'উদ্বৃত্ত' নামক শব্দটিকে, অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত' খাদ্যকেই রপ্তানি করা হচ্ছে! মজা হল, এই একই শব্দের অজুহাতে উনবিংশ শতকের শেষপাদে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসকরা যে দেশকে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুপুরী বানিয়ে খাদ্যশস্য 'রপ্তানি' করত তা এই ভারত। আজ দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের শাসকদলগুলো সেটাই করছে এই ভারতেই। (তথ্যসূত্র ঃ জয়তী ঘোষের নিবন্ধ)

টাকার অভাবেই শাবানার মৃত্যু

একের পাতার পর

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার একটাও রূপায়িত করেনি। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ফাইলে বেঁধে তাকে তুলে দিয়েছে। এমন করে একদিনে নয়, বহুদিন ধরে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে হাসপাতালের শরীরে। সরকারের দ্বারা সৃষ্ট এই রোগ দূর করার পরিবর্তে সরকার আরও বেশি করে চেয়েছে, হাসপাতালে দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে লুঠতরাজের অবাধ রাজত্ব তৈরি হোক, চেয়েছে সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা ধ্বসে যাক, রোগীদের রক্ত শুষে মুনাফা লুটুক বেসরকারি হাসপাতালের মালিকরা। আর তার ভাগ পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠুক দল এবং তার বাহিনী। দেশের লক্ষ লক্ষ রোগীর বেসরকারি নার্সিং হোমে যাবার ক্ষমতা নেই। কারণ, সেখানে যেতে চাই হাজার হাজার টাকা, যা সাধারণ মানুষের নেই। মুষ্টিমেয় যাদের টাকা আছে, তাদের জন্য রয়েছে নামী দামি নার্সিং হোম ও বেসরকারি হাসপাতাল। অবহেলা, ভুল চিকিৎসা সেখানেও নেই তা-নয়, তবে তা থাকে ঝাঁ-চকচকে বাইরের আড়ম্বর, আর চাকচিক্যের রোশনাইয়ের তলায় চাপা।

অন্যদিকে সুদূর গ্রাম-গঞ্জ এবং শহরের গরিব, মধ্যবিত্ত আসেন হাজারে হাজারে সরকারি হাসপাতালে। প্রতিদিনই সেখানে রোগী মরে। যারা বাঁচতে পারত তারাও মরে। সংবাদপত্র রোজ সে খবর দেয় না। তাছাড়া সরকারি হাসপাতালের চার্জ বাড়তে বাড়তে এখন তা কার্যত গরিবের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালে চিকিৎসার ন্যূনতম কোন ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার চিকিৎসকের পদ খালি। বেড না পেয়ে, টাকা জোটাতে না পেরে, বিনা চিকিৎসায় মানুষ তিলে তিলে মরে রোজই। সংবাদপত্র তার খবর দেয় না, মন্ত্রীরাও তার কারণ খোঁজেন না।

সংবাদপত্র খবর বেচে। তাই যে খবর বাজারে পণ্য হিসাবে কাটে তেমন খবরের পেছনে তারা ছোটে। আবার কোন্ খবর কতটা গুরুত্ব দিয়ে ফলাও করে তারা ছাপবে, কেমন করে তা পরিবেশন করবে, সেটা নির্ভর করে মালিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য তার দ্বারা কতটা সাধিত হবে তার ওপর। মিটিং-মিছিল কত খারাপ, সরকারি প্রতিষ্ঠান কত অযোগ্য — ইদানীং মালিকশ্রেণীর স্বার্থে এইটে তারা দেখাচ্ছে। এটা দেখাতে গিয়েই তারা গরিব রিক্সাভ্যান চালকের শিশুকন্যা শাবানার মৃত্যুর বিষয়টি ফলাও করে এনেছে। নাহলে কত মর্মান্তিক মৃত্যুই তো প্রায়ই ঘটে, তার সব খবর খবরের পাতায় থাকে না। এখানে তাদের লক্ষ্য ছিল এইটে দেখানো যে, মিছিলে আটকে গিয়েই শাবানার মৃত্যু হয়েছে। কেন তারা এটা দেখাতে চায়? কারণ মালিকশ্রেণী চায় তারা অন্যায়ভাবে যত শ্রমিকদের কষ্টার্জিত পি-এফের টাকা আত্মসাৎ করুক, শ্রমিক ছাঁটাই করুক, তাদের ন্যায্য মজুরি না দিক, ইচ্ছামত লকআউট-ক্লোজার করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনে মৃত্যু ডেকে আনুক, এর বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল-আন্দোলন যেন না হয়। কিন্তু এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে পড়ল, হাসপাতালে এখন যা খরচ, শাবানার বাবা তা না দিতে পারাই মৃত্যুর কারণ।

সংবাদে প্রকাশ, এমার্জেন্সির ডাক্তার তাকে বলেছিলেন, রোগী একটু সুস্থ হলে কিছু পরীক্ষা বাইরে করাতে হবে। এজন্য হাজার খানেক টাকা লাগতে পারে। শুনে গরিব ভ্যানচালক বাবা শাবানাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাড়ি ফেরার পথেই সে মারা যায়। মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন 'কমিউনিকেশন গ্যাপ' বা বোঝার ভুল। এ কথার তলায় তিনি যেটা চাপা দিতে চাইছেন, তাহল, মেডিক্যাল কলেজের মতো বড় হাসপাতালেও প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এর পরেই হ'ল এস এস কে এমে ছাত্রী সুস্মিতার মর্মান্তিক মৃত্যু। সংবাদপত্র একে সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকদের অমানবিকতার নজির হিসাবেই এনেছিল। কিন্তু এখানেও কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হল। দেখা গেল, হাসপাতালে বেড দেওয়ার ক্ষমতা সুপার কুক্ষিগত করে রেখেছেন। কার স্বার্থে তিনি সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন? বছরের পর বছর এ জিনিস এভাবেই চলেছিল সকলের অগোচরে? সুপার যে বেড দেওয়ার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন তা কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানতেন না? হাসপাতালের ওপর শাসকদলের যে তদারকি কমিটি আছে — তার সদস্যরা কি তা জানতেন না? সবই তাঁরা জানতেন। তাঁরা এর সুযোগ নিয়েছেন। শাসকদল সুপারকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়েছে, অসহায় রোগীদের বাধ্য করেছে হয় হাসপাতালের দুষ্টচক্রকে টাকা দিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে, নতুবা বেডের জন্য শাসকদলের

পাঁচের পাতায় দেখুন

দোষীদের আড়াল করল সরকার

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"রাজ্য সরকার পি জি হাসপাতালে ছাত্রী মৃত্যুর জন্য অভিযুক্তদের 'শাস্তি'র নামে মূল কর্মকর্তাদের নিছক বদলির ব্যবস্থা করে একদিকে গুরুপাপে লঘু দণ্ড দিয়েছে, অন্যদিকে মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর ও হাওড়া হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে মৃত্যুজনিত অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যখাতে ক্রমাগত বরাদ্দ কমিয়ে, সর্বক্ষেত্রে অত্যধিক চার্জ বাড়িয়ে, ব্যবসায়ীকরণ করে গরিব-মধ্যবিত্তদের চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করেছে, যোগ্যতা ও রোগীদের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের চাকরি দিয়ে কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করে সর্বত্র এক অসাধু দুষ্টচক্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং হাসপাতালে প্রয়োজনীয় বেড, চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদির অভাব সৃষ্টি করেছে। পঞ্চায়েতগুলির হাতে গ্রামীণ চিকিৎসাকে তুলেও দিচ্ছে। এই জনস্বাস্থ্যবিরোধী নীতির জন্যই রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা দাবি করছি — বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, বিভিন্ন মেডিক্যাল সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক এবং এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"

ইরাকে মার্কিন সেনারা আত্মহত্যা করছে

ইরাকি প্রতিরোধ দিনে দিনে যে বাড়ছে ও সংহত হচ্ছে এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল খোদ মার্কিন সামরিক কর্তার বিবৃতিতেই। মার্কিন সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে আগ্রাসন সচিব বলাই উপযুক্ত। কারণ, নিজেদের প্রতিরক্ষার যে যুক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেয়, সেটা নেহাতই ভাঁওতা — যা দিয়ে তারা নিজের দেশের মানুষকে ও বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করে অপর দেশে অন্তর্ঘাত, ষড়যন্ত্র, খুন, সন্ত্রাস ও আগ্রাসন চালায়, এবং দুর্বল দেশের প্রতিরক্ষাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সকলেই এখন জানে, ইরাকের দ্বারা আমেরিকার আক্রান্ত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ ঐ দেশটি দখল করে লুট করার জন্যই। এক ধরনের সামরিক দখলও তারা ইরাকে কায়েম করেছে। কিন্তু কাজটা যত সহজে হবে বলে মার্কিন শাসকরা ভেবেছিল, বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। সাদ্দাম সরকারকে তারা অস্ত্রের জোরে উৎখাত করেছে, কিন্তু ইরাকি জনগণকে তো দেশছাড়া করতে পারেনি। আজ যেটা ইরাকে দেখা যাচ্ছে, সেটা দেশপ্রেমিক জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে না — যার পরিচয় মার্কিন দখলদার সেনার বিরুদ্ধে ইরাকি যুবকদের আত্মঘাতী আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে। দখলদারদের যত অস্ত্রশক্তিই থাক, জনগণের প্রতিরোধকে তা কখনই পরাস্ত করতে পারে না। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আজ আতঙ্কিত। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে রামসফেল্ডের কণ্ঠে। এই যুদ্ধবাজ সামরিক সচিব পেন্টাগণের কাছে পাঠানো এক নোটে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে' কৈফিয়ত তলব করেছেন। পরের লাইনেই হুঁশিয়ারির মত করে সামরিক কর্তাদের জানিয়েছেন, 'ইরাকে আমাদের সামনে রয়েছে দীর্ঘ ও কঠিন কাজ।' তবে যে গত ৯ এপ্রিল বাগদাদ দখল করার পর ১ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা করেছিলেন — 'ইরাকের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ (major combat) শেষ হয়ে গেছে।' অর্থাৎ ইরাক এখন সম্পূর্ণ আমেরিকার দখলে। আসলে বুশ-রামসফেল্ডরা জানত না যে, ইরাকিদের ঘরে ঘরে প্রতিরোধ যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি ততদিনে সারা হয়ে গিয়েছে।

মার্কিন সেনাদেরও বোঝানো হয়েছিল, তারা ইরাকে যাচ্ছে সেখানকার জনগণকে স্বৈরাচারি শাসন থেকে মুক্তি দিতে। একথাও বোঝানো হয়েছিল, অতি অল্পসময়েই ইরাকে 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার' পতাকা উড়িয়ে মার্কিন সেনারা ঘরে ফিরতে পারবে। সেনারা এখন বাস্তবে দেখছে, ইরাকের জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দখল থেকে মুক্তি চাইছে। প্রতিদিন ইরাকি প্রতিরোধে সেনারা মারাও যাচ্ছে। অন্যদিকে মার্কিন শাসকরা চাইছে সেনারা ইরাকের মাটিতে থাকুক। কিন্তু আরও কত দিন, কত মাস, কত বছর তার কোনও হিসাব শাসকরাও দিতে পারছে না। অতএব, ইরাকের মাটিতে দখলদাররূপে যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে জেনেও মার্কিন সেনাদের দেশে ফেরার রাস্তা নেই। এই মানসিক চাপ সইতে না পেরে ইরাকে গত সপ্তাহে অন্তত ১৩ জন মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করেছে। ওয়াশিংটনের কর্তাদের ব্যাখ্যা অন্যরকম। তাদের মতে, ওরা নিজেদের আহত করে ঘরে ফেরার জমি তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আঘাত গুরুতর হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে। কর্তাদের ব্যাখ্যা যাই হোক, বাস্তবে ইরাকি জনগণের তীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধের সামনে পড়ে ঘরে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই যে মার্কিন সেনাদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছে, তাতে সংশয় নেই।

ইজরায়েলি পাইলটরা অসামরিক মানুষকে হত্যা করতে অস্বীকার করলেন

বিগত কয়েক দশক ধরে প্যালেস্টাইনে যে ইজরায়েলি সামরিক হানা অব্যাহত আছে এবং সম্প্রতি 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের নামে প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামকে যেভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের মানুষের প্রতিবাদও চলছে দীর্ঘকাল।

কিন্তু সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে খোদ ইজরায়েলে। ইজরায়েলের বিমানবাহিনীর রিজার্ভ পাইলট ও বায়ুসেনাদের ২৭ জনের একটি দল বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল ড্যান হালুজের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, প্যালেস্টাইনের অসামরিক নাগরিকদের বসতির ওপর ইজরায়েলি বিমান হানায় তাঁরা আর অংশ নেবেন না।

ইজরায়েলে পাইলটরা একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। পাইলটদের এই ধরনের প্রতিবাদ তাই সেদেশে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে ৫০ জন সৈন্য ও অফিসারের একটি দল এই ধরনের একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেছিল এবং ৫০০'রও বেশি সৈনিক ঐ প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক তা সাধারণ মানুষের মধ্যে তত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এবারে পাইলটদের বিশেষ পদমর্যাদা সেই অভাব পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেজর জেনারেল ড্যান হালুজ অবশ্যই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পাইলটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তারা রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

এদিকে একটি ইজরায়েলি পত্রিকা জানিয়েছে, যাঁরা এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নামটি হল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইফ্‌তা স্পেকটর। বিমানবাহিনীর পাইলটদের মধ্যে এঁর বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা সম্পর্কে নানা কাহিনী চালু আছে, যেজন্য তাঁকে সবাই সমীহ করে।

স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে তাঁরা বলেছেন, "আমরা অভিজ্ঞ ও সক্রিয় পাইলটগণ, যারা এই রাষ্ট্রের সেবা করেছি এবং এখনও করে যাচ্ছি, তারা ইজরায়েল যে সমস্ত ভূখণ্ডে বেআইনি ও অনৈতিক আক্রমণ চালাচ্ছে, সেখানে আক্রমণ করার নির্দেশের প্রতিবাদ করছি। ..... আমরা অসামরিক ব্যক্তিগণের ওপর আক্রমণ করতে অস্বীকার করছি।

এই বেআইনি ও অনৈতিক কাজ ইজরায়েল সমাজকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে। দীর্ঘদিন ধরে এই হানাদারি চলার ফলে ইজরায়েলের নিরাপত্তা ও তার নৈতিক বল প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।"

'আমরা আন্দোলন করব'

তিনের পাতার পর

অবমাননার দায়ে জেলে যেতে তৈরি আছি। সবচেয়ে আক্রমণের সময়ে, ৪৯/৫০ সালে আমি জেলে গিয়েছিলাম, আমি দীর্ঘ হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি। আর এখন পশ্চিমবাংলায় লালঝাণ্ডা যখন উড়ছে, আর একবার জেলে যাব। দেখা যাক জমিদারী কতদিন থাকে। এখানে আমার অনেক পুরনো বন্ধু আছেন, যাঁরা নানা ভাগে ভাগ হয়ে আছেন। আমি তাঁদের বলি — এখনো সময় আছে, ভারতবর্ষের মহিমাকে, তার বামপন্থী মহিমাকে, গণতান্ত্রিক মহিমাকে, সংগ্রামের মহিমাকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারি এবং একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারি। ছোট্ট কাঁটা ক্ষুদ্র হলেও তার বিদ্ধ করবার ক্ষমতা অসাধারণ। মাননীয় জজসাহেব যে ছোট্ট কাঁটাটুকু বিঁধিয়েছেন, তার বিদ্ধ করবার ক্ষমতা অসাধারণ, আমাদের নাড়াচাড়া দিয়ে দিয়েছেন। (শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে) বুঝুন, আমরা খুব ঘুমোচ্ছিলাম। আজ আমাদের ঘরে চোর ঢুকেছে। আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য এসেছে। জাগুন! জাগুন! এই কথা বলেই শেষ করছি।

হাসপাতালে মৃত্যুমিছিল চলুক

চারের পাতার পর

অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে।

ক্ষমতায় বসে শাসক সি পি এমকে যেসব আন্দোলনের আঘাতে বিপদে পড়তে হয়েছে তার অন্যতম হল ডাক্তারদের আন্দোলন। এই আন্দোলনের সময়েই তারা বুঝতে পারে তাদের পায়ের তলার মাটি অনেকাংশেই আলগা হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারদের মধ্যে তাদের প্রভাব নেই বললেই চলে। তখন তারা পরিকল্পিতভাবে ডাক্তারদের সংগঠনে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করে। এজন্য ডাক্তারদের মধ্যে সুযোগসন্ধানীদের তারা একজোট করে একটা ধারণা তৈরি করে দেয় যে, শাসক সি পি এমের ছত্রছায়ায় ও সুনজরে থাকলে সাত খুন মাফ। শাসকদলের সংগঠনে নাম লেখালে শহরে পোস্টিং, সহজে পদোন্নতি। তাছাড়া হাসপাতালে রোগী না দেখলে, দাপটে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করলে, আট ঘণ্টা ডিউটি চার জন ভাগ করে দু'ঘণ্টা কাজ করলেও গায়ে আঁচ লাগবে না। '৮৩ সালের জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন ও তারপর হেলথ সার্ভিস এসোসিয়েশনের জোরালো আন্দোলন ভাঙতে শাসকদল সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজের সর্বস্তরের মুনাফাসন্ধানী মনোবৃত্তি এবং দায়িত্বহীনতার যে প্রভাব চিকিৎসকদের মধ্যে পড়ছিল, সি পি এম তার গতি দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

'৯০ সালে বিশ্বায়ন ও নয়া আর্থিক নীতি অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় হ্রাস ও পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা গুটিয়ে এনে শিক্ষা, পরিবহন, চিকিৎসাব্যবস্থার বেসরকারীকরণ জোরকদমে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার। সি পি এম মুখে বিরোধিতা করলেও কাজে পুরোপুরি এই নীতি প্রয়োগ করায় প্রথম বলি হয় জনস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যখাতে খরচ তারা বিপুলভাবে কমায়, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা ছেঁটে অর্ধেক করে দেয়, হাসপাতালে যারা সবচেয়ে বেশি কাজ করে সেই হাউসস্টাফদের সংখ্যা অর্ধেক করে, হাজার হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করে এবং দফায় দফায় চার্জ বৃদ্ধি করে, ফ্রি-বেড প্রায় তুলে দেয়। ভাঙাচোরা এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ পূরণ করতে এবং প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে পেশাগত যোগ্যতার বদলে শাসকদলের হুকুমবরদারিকে মাপকাঠি করে প্রশাসনিক পদগুলি বশংবদ ব্যক্তিদের দিয়ে ভরে দেয়। শাসকদলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠে টাউটচক্র, যাদের টাকা দিলে বেড থেকে রক্ত কিছুরই অভাব হয় না। এস এস কে এম হাসপাতালের তদন্ত রিপোর্ট পড়ে বুদ্ধদেববাবু এসব কথা বলেননি। টাউটদের টাকা দিলে সুস্মিতা ভর্তি হতে পারত কিনা, বেড পেত কিনা — এসবও তদন্তের আওতায় পড়ে নি। বুদ্ধদেববাবু সাপ বের হওয়ার ভয়ে কেঁচো খুঁড়তে চাননি। বরং সংবাদপত্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই সুযোগে তারা হাসপাতালে গণপ্রতিবাদ বন্ধ করার প্রথম ধাপে হাসপাতালে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, এমনকি মিছিল, অর্থাৎ মৌনমিছিল পর্যন্ত বন্ধ করার ফতোয়া দিচ্ছেন। সরকারের এই মনোভাবই বলে দিচ্ছে — সরকারি হাসপাতালের চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করা, ডাক্তার-নার্স-সেবাকর্মীদের দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনার কোন ইচ্ছাই সরকারের নেই। সরকারি হাসপাতালে একের পর এক মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তাদের বিচলিত ভাব আসলে ভাণ মাত্র। বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসায়ী ও দুর্নীতিচক্রের কাছে তাদের টিকি বাঁধা।

সুস্মিতার মৃত্যুতে যেটুকু তাদের নড়ে বসতে হয়েছে তার পিছনে রয়েছে জনগণের বিক্ষোভ। চিকিৎসাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবার বদলে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে দেখার পরিণতিতে গরিব মানুষকে যে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে — এটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। এজন্যই বেসরকারীকরণ এবং চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। একচেটিয়া সংবাদমাধ্যম সেই আন্দোলনকে ব্ল্যাকআউট করেছে। উল্টে তারা বলছে, বিনা পয়সায় কিছু পাওয়ার মনোভাব নাকি ঠিক নয়। উপযুক্ত মূল্য দিয়েই চিকিৎসা কিনতে হবে। বাজার অর্থনীতির নগদ মূল্যের ধাক্কায় মানবিক মূল্যবোধ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। একে জাগাতে, সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে চাই প্রতিবাদ, আন্দোলন — সঙ্কীর্ণ ভোটের স্বার্থে, রাজনৈতিক চমকের স্বার্থে নয়, জনস্বার্থে জনস্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলন আজ জরুরি প্রয়োজন। সরকার চাইছে হাসপাতালে মৃত্যুমিছিল চলুক, প্রতিবাদ মিছিল বন্ধ হোক। বাঁচার তাগিদেই এর বিরুদ্ধে জনগণকে দাঁড়াতে হবে। মৃত্যুর জন্য বহু পথ এ সমাজে খোলা; কিন্তু বাঁচার একটাই পথ। তাহল সঠিক সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতৃত্বে উন্নত মূল্যবোধের বনিয়াদের উপর গণআন্দোলন গড়ে তোলা। সেই আন্দোলন অবশ্যই বর্তমান সমাজের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক হতে হবে। 'নিয়ন্ত্রণে'র নামে মিটিং-মিছিল-আন্দোলন বন্ধ করার সরকারি চক্রান্তকে পরাস্ত করে আন্দোলনের চাপেই সরকারি হাসপাতালের বহুমুখী রোগ দূর করতে অনিচ্ছুক সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

জল নিগম গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

লাভের ব্যবসার ফাঁদে পানীয় জল

জানা গেল, জলের জোগান বাড়ানোর জন্য বৃহত্তর কলকাতায় জল নিগম গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪.৯.০৩)। সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বব্যাঙ্ক চাইছে — 'জলকে সামাজিক বিষয় থেকে আর্থিক বিষয় করা হোক।' সে-ক্ষেত্রে জলকর বসিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। তাই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব, 'রাজ্য সরকার পুরসভা এলাকায় জলের জন্য পৃথক নিগম গঠন করুক এবং তারপর জলকর বসানোর কাজটি ধাপে ধাপে করা হোক।' নিগম চালু করার জন্য এককালীন প্রাথমিক যে ব্যয় হবে, সেই অর্থ সহজ ঋণ হিসাবে দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্কের জল নিগম গঠনের এই প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকার নানা স্তরে আলোচনা করছে। এবং শুধু আলোচনাই নয় — আমরা দেখতে পাচ্ছি, জল নিগম গঠনের আগেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন পৌরসভায় জলকর বসানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক জানিয়েছে — তাদের এই জল নিগম গঠনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে যেমন রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন, তেমনি পানীয় জলের মানেরও উন্নতি ঘটবে। অর্থাৎ, জল নিগম গঠনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক নানা ধরনের কথা বলছে এবং রাজ্য সরকারের নানা মহলে সেইসব কথা গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়িত করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই পরিকল্পনা কেন এবং কাদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা বুঝতে গেলে জল নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক দুনিয়া জুড়ে যে লাভের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে তার সম্যক চরিত্র অনুধাবন করা দরকার।

মানুষের জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা কি তা নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন — ১৯৯৮ সালে ২৮টি দেশ জলসঙ্কটে ভুগছিল, ২০২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। এই বিশ্বে ১৯৭০ সালের পর মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ কমেছে ৩৩ শতাংশ। ১৯৫১ সালে ভারতে মাথাপিছু জল পাওয়া যেত বছরে ৩৪৫০ ঘনমিটার, ১৯৯০-এ তা দাঁড়িয়েছে ১২৫০ ঘনমিটার। মনে করা হচ্ছে, ২০৫০-এ তা কমে দাঁড়াবে ৭৬০ ঘনমিটার। মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদানের জোগান দিনের পর দিন কমতেই থাকবে। সাধারণ মানুষের জীবনে এই খবর ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিতবাহী হলেও — সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক পুঁজির কাছে এটা অত্যন্ত সুখবর। তাদের স্লোগান হল — ''Turn this scarcity into market opportunity''। অর্থাৎ, 'জলের অভাবকে বাজার সম্ভাবনায় পরিণত কর।' এই উদ্দেশ্যে বহুজাতিক পুঁজি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জল-বাজারকে ব্যবহার করে মুনাফার থলি স্ফীত করার প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ জলের উৎসগুলিকে দখল করতে চাইছে। এই জল-বাজারের গুরুত্ব ওদের কাছে কতটা তা বোঝা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরানোলডিনের কথায়। ১৯৯৫ সালে তিনি বলেছিলেন — ''এই শতাব্দীর যুদ্ধ যদি তেল নিয়ে হয়, পরের শতাব্দীতে তা হবে জল নিয়ে।'' (''If these wars of this century were fought over oil, the wars of the next century will be fought over water''. — The Economist, September 15, P.-34)

বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাকে নিয়ে এই যুদ্ধের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাঙ্ক দু'হাজার কোটি ডলারের জল প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ৪৮০ কোটি ডলার শহরাঞ্চলের জলসরবরাহ, ১৭০ কোটি ডলার গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলপ্রকল্প, ৫৪০ কোটি ডলার সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জল বিদ্যুতের জন্য ১৭০ কোটি ডলার, ৩০০ কোটি ডলার জল সম্পর্কিত পরিবেশগত প্রকল্পের জন্য। বিশ্বব্যাঙ্কের জল সম্পর্কিত এই ঋণ প্রকল্পের ২০ শতাংশই পেয়েছে দক্ষিণ এশিয়া।

বিশ্বব্যাঙ্ক হিসাব করে দেখেছে, প্রতি বছর জল নিয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা হওয়া সম্ভব। তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে সেখানকার নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ করার যে সরকারি পুরব্যবস্থা রয়েছে তাকে ধ্বংস করে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে একটা মুক্ত জল-বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জল-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওদের পরিকল্পনা হল — ''The basic object of reform is to move, towards a commercial and consumer orientation in service provision. The entire outlook changes from publicly provided free services as a right, to a consumer orientation with access to service''. (Source, Meera Mehta — A review of public-private partnerships in the water and environmental sanitation sector in India, P. 7). এই হল আসল কথা। অর্থাৎ, জল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যাবে। জল পাওয়া আর মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে গণ্য হবে না। জলও পণ্যে পরিণত হবে। ব্যবসায়ীদের মুনাফা দিয়েই তা আমাদের বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। জল নিগম গঠনের ক্ষেত্রে — "জলকে সামাজিক বিষয় থেকে আর্থিক বিষয় হিসাবে গণ্য করার" বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশের এই হল আসল তাৎপর্য।

দুনিয়া জুড়ে বিশ্বব্যাঙ্ক জলের ব্যবসা বেসরকারীকরণ করাতে শুরু করে দিয়েছে। ১৯৯০ সালের গোড়ায় বিশ্বব্যাঙ্ক আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, চিলি, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়াতে জল প্রকল্পে বেসরকারীকরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। চিলিতে ঋণদানের শর্ত ছিল ফ্রান্সের জল কোম্পানি সুয়েজ লিওনিয়েজকে ৩৩ শতাংশ মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া। বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তের ফলে কাসাব্লাঙ্কায় জলের দাম বেড়ে যায় ৩ গুণ, ব্রিটেনে বৃদ্ধি পায় ৬৭ শতাংশ। জল-বাণিজ্য বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার হাতে চলে যাবার ফলে বাইওয়াটার কোম্পানি ফিলিপিন্সে জলের দাম বাড়িয়ে দেয় ৪০০ শতাংশ। ফ্রান্সে গ্রাহকদের পরিষেবা চার্জ বৃদ্ধি করা হয় ১৫০ শতাংশ। ইংল্যাণ্ডে জলের মূল্যবৃদ্ধি পায় ৪৫০ শতাংশ এবং জল কোম্পানিগুলির মুনাফা ৬৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জলের বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে নিউজিল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ পথে নামতে বাধ্য হন। ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের নানা দেশ জলের বেসরকারীকরণ করতে শুরু করে। বহু দেশে ঋণদানের শর্ত হিসাবে জলকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার দাবি উত্থাপন করে বিশ্বব্যাঙ্ক। দু'হাজার সালে আই এম এফ আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে ৪০টি ঋণ মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে ১২টি ক্ষেত্রে এই শর্ত ছিল যে জলকে সম্পূর্ণ বা আংশিক বেসরকারীকরণ করতে হবে এবং কোন ক্ষেত্রেই ভর্তুকি দেওয়া চলবে না, সমস্ত খরচ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। ঋণ পাওয়ার জন্য আফ্রিকার সরকারগুলো ব্যাপকহারে জলের বেসরকারীকরণ করছে। ঘানার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, গরিব মানুষকে তাদের আয়ের ৫০ শতাংশ জলের জন্যই ব্যয় করতে হচ্ছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চাপে অনুন্নত দেশগুলি জলের বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করলেও ভারতের জল-বাজার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে শুধু এদেরই চাপ বা স্বার্থ দায়ী, একথা বলা চলে না। জল-বাজার দখলের জন্য যেমন কোকাকোলা, পেপসি, ডিভেণ্ডি ইণ্টারন্যাশনাল, টেমস ওয়াটার, বাই ওয়াটার ইত্যাদির মত বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র জল যুদ্ধ — তেমনি দেশিয় জল কোম্পানিগুলিও আসরে নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যে পার্লে, বিসলেরি দেশের জল বাজারের ৬০ শতাংশ দখল করে বসে আছে। এরা বলছে — ''Bisleri has to be made a mega brand. In the next two to three years, Bisleri must outsell both the Cola companies together.'' এছাড়াও তৃপ্তি, গঙ্গা, ডিউড্রপস ইত্যাদি ভারতীয় জল-কোম্পানি দেশের বাজারের ১৭ শতাংশ দখল করে আছে। সাথে সাথে এইসব কোম্পানিগুলির সঙ্গে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। মনসান্তোর সাথে ইউরেকা ফোর্বস / টাটার যৌথ উদ্যোগ এবং এই ধরনের আরও ৩০টি উদ্যোগের কথা এখনই বলা যেতে পারে। দেশি ও বিদেশি পুঁজির এই স্বার্থবোধ আজ মিলিত হয়ে জলের উপর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে অস্বীকার করে তাকে মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত করতে চাইছে।

বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে যে যুক্তি ওরা তুলে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বেসরকারি ব্যবস্থা দক্ষ এবং তাই সাধারণ মানুষ উন্নত মানের জল পাবেন — এই হল ওদের প্রধান কথা। কলকাতায় জল নিগম গঠনের ক্ষেত্রেও এই পুরনো যুক্তি বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তারা পুনরুল্লেখ করেছেন। কলকাতায় জল নিগম গঠন করে জলকে বেসরকারি হাতে তুলে দিলে উন্নত মানের বীজানুমুক্ত পরিশ্রুত জল পাওয়া যাবে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে বিশ্বব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের নানা দেশে যেখানে জলকে বেসরকারি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জলকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ফলে ব্রিটেনে কিভাবে জলের দর বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু অবাক করার মত তথ্য হল — সাথে সাথে পেটের রোগও বেড়ে গিয়েছে প্রায় ৬ গুণ। এবং এজন্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন দায়ী করেছে জলব্যবস্থার বেসরকারীকরণকে। ফ্রান্সে জলব্যবস্থা বেসরকারীকরণের পর ফরাসি সরকারের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে — ''5.2 million people received bacterially unacceptable water''. (Source : The water manifests by Petrella. P. 73) এইরকম আরও বহু উদাহরণ তথ্য সহযোগে পরিবেশন করা যেতে পারে। সুতরাং বেসরকারি জলব্যবস্থা উন্নতমানের বীজানুমুক্ত জল সরবরাহ করবে, একথা আদৌ বলা যায় কি?

দুঃখের হলেও একথা সত্য — এসব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের সি পি এম পরিচালিত সরকার জলের উপর রাজ্যবাসীর স্বাভাবিক অধিকারের প্রশ্নটি অস্বীকার করে জলব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সাথে পরামর্শক্রমে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। এরই প্রাথমিক ধাপ হিসাবে রাজ্যব্যাপী পৌরসভাগুলিতে জলকর বসানো হচ্ছে, জলসরবরাহের নানা পর্যায় বিভিন্ন ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং এইভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারীকরণের বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত মহাজনপন্থা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। সর্বনাশা এই নীতিকে পরাস্ত করার জন্য এখনই উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

১৬ অক্টোবর কেরালার কালিকটে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করছেন ডঃ এন. এ. করিম। মঞ্চে উপবিষ্ট কে পানুর, সি. কে. লুকোস, ডঃ ডি সুরেন্দ্রনাথ, অ্যাডভোকেট মাঞ্চে রি সুন্দর রাজ, ডাঃ ভি. বেনুগোপাল এবং ফাদার আব্রাহাম জোসেফ।

সন্ত বনাম সত্য

ঘটনাটা অলৌকিকই বটে! এই রাজ্যের একটি প্রান্তিক জেলার একজন আদিবাসী মহিলার পেটের টিউমার (ডাক্তারি পরিভাষায় যার নাম টিউবারকিউলোমা) বিনা 'চিকিৎসায়' সেরে গেছে। যখন সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও চিকিৎসা ব্যবস্থা একটা উচ্চমূল্যের পণ্য হয়ে উঠেছে, সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে, যখন প্রাইভেট হাসপাতালে ডাক্তারের ফি, শয্যার ফি, ওষুধের দাম, বিভিন্ন পরীক্ষার চার্জ, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে কে এক মনিকা বেসরা শুধু বিনা পয়সায় 'চিকিৎসার' সুযোগই পেয়েছেন তাই নয়, পুরোপুরি সুস্থও হয়ে উঠেছেন! অলৌকিক কাণ্ড ছাড়া একে আর কী বলা যাবে!

হয়তো এইজন্যই ঘটনাটা ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছিল। ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ রোমের ভ্যাটিক্যান অনেক দিন ধরেই মাদার টেরিজাকে সন্ত হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছিল। কথাটা কানাঘুষোয় চারদিকে রটেও গিয়েছিল। শুধু একটাই সমস্যা তাঁদের পীড়িত করে যাচ্ছিল। আজীবন গরিবদের মধ্যে পড়ে থেকে, মাদার টেরিজা একা নন, চার্চের অনেক ফাদার এবং নান-ই সেবা করে থাকেন। তাঁদের নাম প্রচার হয় না। এত সম্পদও তাঁরা জোগাড় করতে পারেন না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিও তাঁরা পান না। তাঁদের সকলকেই তো সন্ত বলা যায় না। সন্ত হতে পারেন তাঁরাই, যাঁদের বেশ কিছু অলৌকিক কাজ করার গল্প প্রচলিত আছে। তা মাদারের এইরকম গল্প বোধ হয় পাওয়া যাচ্ছিল না।

অসুবিধা আরো আছে। খ্রিস্টের সমকাল থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্তও মানুষ বহু রকম রোগেই — আজ যেগুলোকে খুব সাধারণ নিরীহ রোগ বলে মনে হয়, যেমন, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মৃগি ইত্যাদি — মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। সকলেই মারা যেত এমন নয়। রোগ সংক্রমণের দুর্বলতা এবং শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক সময় অনেককে বাঁচিয়ে দিত। সে সময় সাধারণ মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য সাধু-সন্ত-পির-দরবেশদের কাছে যেত, আজও মানুষ যায়। অভাবেও যায়, বিশ্বাসেও যায়। ঈশ্বরের এই মানুষ মারা খেয়ালে তাঁরা অসহায় বোধ করলেও সাধু-সন্তরা অশেষ মমতায় এই সব রোগ-পীড়িত মানুষদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতেন, ঠাকুর দেবতা, দরগা-মাজার কিংবা খ্রিস্ট-মূর্তি বা ক্রুশের ছোঁয়া জল-টল দিতেন। যারা প্রাকৃতিক কারণেই হয়তো বেঁচে উঠত, তারা ভাবত — এই স্পর্শ, এই মন্ত্রপূত জল বা এইরকম অন্যকিছুই তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এ একটা দৈব-ঘটনা না হয়েই যায় না। আর যিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তাঁর একটা অলৌকিক মাহাত্ম্য আছে বলে তারা মনে করত। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে এইভাবেই বহু সাধু-সন্ত-পির-দরবেশ সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনার অতিকথা গড়ে উঠেছিল। কি ইউরোপে, কি ভারতে।

এখন অবস্থাটা অনেকটা পাল্টে গেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ফলে একে একে এইসব মারণ রোগের অধিকাংশই এখন নিরাময়যোগ্য হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরসেবকদের অলৌকিক কেরামতি দেখানোর সুযোগ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। মাদারের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি নিজেও যখনই অসুস্থ হয়েছেন, তখনই আধুনিক চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়েছেন। চার্চে বসে প্রার্থনা করে কিংবা পবিত্র আইকন ছুঁয়ে রোগমুক্তির আশা করেননি। এখন সেই মাদারের হাতে অন্য কারোর অলৌকিক রোগমুক্তির কাহিনী কোথায় পাওয়া যাবে?

এরকম একটা সময়ে মনিকা বেসরার ঘটনা চার্চের কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এটাকেই তাঁরা বেছে নিয়েছেন মাদার টেরিজার অলৌকিক সন্ত-ক্ষমতা প্রমাণের উদাহরণ হিসেবে। ঘটনাটা বেশ ঘষে-মেজে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রোমের ভ্যাটিক্যান সিটিতে। মহামান্য পোপ শুভদিন দেখে মাদার টেরিজাকে মরণোত্তর ঈশ্বরের 'আশীর্বাদধন্যা' খেতাবে ভূষিত করেছেন। বালুরঘাটের অখ্যাত, অজ্ঞাত আদিবাসী মেয়ে সেই উপলক্ষে পোপের বাড়তি আশীর্বাদ তো পেয়েইছেন, সঙ্গে পেয়েছেন বিশ্বজোড়া প্রচার।

টেরিজার আধ্যাত্মিক পদোন্নতি ক্যাথলিক চার্চের বিষয়। কিন্তু এর মধ্যে যে অন্ধতা ও মিথ্যাচারকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে — তাতে ঘটনাটির সমাজতাত্ত্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করা দরকার। শোনা যাচ্ছে — সংশ্লিষ্ট মহিলার চিকিৎসকদের অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁরা যেন লিখে দেন, টিউবারকিউলোমাটি ম্যালিগন্যান্ট ছিল, এ থেকে ক্যানসার হয়ে যেতে পারত এবং তাঁরা এর চিকিৎসা করতে পারেননি।

বিভিন্ন মহল থেকে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে — মনিকা বেসরার অলৌকিক ক্যানসার নিরাময়ের গল্প প্রচারের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, এরকম প্রশ্ন তো উঠবেই যে, মাদার কি শুধুমাত্র একজন রোগীকেই নিরাময় করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? টিটাগড়ে তাঁর পরিচালনাধীন আশ্রমে তো কুষ্ঠরোগীও ছিল — তাঁদের তিনি ছুঁয়ে বা কৃপাবর্ষণ করে আরোগ্য প্রদান করতে পারেননি কেন? খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সেবাধর্ম পালনের কাজের সঙ্গে এইভাবে অলৌকিকতার মোহজাল যুক্ত করার দরকার কী?

আসলে দরকারটা সাধারণ মানুষেরও নয়, ধর্ম বিশ্বাসেরও নয়। দরকারটা হল সেই সমাজব্যবস্থার এবং সেই শাসকশ্রেণীর যাদের কাছে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে, অলৌকিক রহস্যের নামে মোহগ্রস্ত করে রাখা তাদের টিকে থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামোতে, বিশেষ করে, তার বর্তমান ক্ষয়রোগগ্রস্ত বাজারহীন বাজার ব্যবস্থায়, মানুষের অস্তিত্বের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিও ব্যবসায়িক পণ্যে পর্যবসিত এবং বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত, সেখানে কোটি কোটি গরিব নিম্নমধ্যবিত্ত বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ অসন্তোষ তো ধূমায়িত হবেই। তার সাথে যদি শিক্ষা, চেতনা যুক্ত হয়, শ্রেণীস্বার্থের বোধোদয় ঘটে, যদি তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে পারে, তখন শুধু বিক্ষোভের জ্বালাতেই তা সীমিত থাকবে না। জাগবে সমাজ পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দেখা দেবে বিপ্লবের সম্ভাবনা। তাই পুঁজিবাদের প্রয়োজন নানাভাবে সেই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখার, মানুষের চেতনাকে বিপথগামী করার।

তার জন্য অনেক রকম কায়দাকানুন থাকলেও সবচেয়ে সহজলভ্য এবং ব্যাপক প্রযোজ্য রাস্তা হল — গত শতকের পঞ্চাশের দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনেতা জন ফস্টার ডালেসের ভাষায় — ধর্মীয় আবেগকে উসকে দেওয়া। এক সময় ঠিক এই কাজটাই করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা — এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ আনার জন্য। তবে এই ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দেওয়ার প্রশ্নে ডালেস ছিলেন সম্পূর্ণ বাছবিচারহীন! যেখানে যে দেশে যে সময়ে যে ধর্মকে যে বিশ্বাসকে উস্কে দেওয়া যায় তাই সই। খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম — কোনোটাতেই কোনো অসুবিধা নেই। মূল লক্ষ্য হল, ধর্মের নামে, ধর্মীয় পবিত্রতা ও শুদ্ধতা রক্ষার নামে একদিকে অলৌকিক অধ্যাত্মবাদী রহস্যাবৃত চিন্তাভাবনায় অন্ধ বিশ্বাস ও আবেগকে বাড়িয়ে তোলা, অপরদিকে নিজের ধর্মকে অন্য সব ধর্মের চেয়ে বড় বলে মনে করা, অন্য ধর্ম ও অন্যতর ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণার চোখে দেখা, এমনকি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রবণতাকেও চাগিয়ে তোলা। এর জন্য কতটা মিথ্যাচার হল, জেনেশুনে কী কী ভুল বলা হল — তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

সাম্রাজ্যবাদীদের বোনা বীজের ফল হিসাবে আজ সারা পৃথিবী জুড়েই ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা ও ক্রিয়া যে ভয়ানক উন্মাদনার জন্ম দিয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন ও অস্তিত্বের সংগ্রাম, পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীসংগ্রাম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে সংগঠিত ধর্মের গরিব-সেবার কর্মকাণ্ডকে। সেবক ও সেবিকাদের সততা নিষ্ঠা থাকলেও যার ভিত্তি হল গরিবের অস্তিত্ব, গরিবীর মর্যাদায়ন। অর্থাৎ যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গরিব সৃষ্টি করে, টিকিয়ে রাখে এবং সংখ্যায় বাড়ায়, তাকে মেনে নেওয়া, তাকে ঈশ্বরের পাঞ্জার ছাপ দিয়ে মহিমান্বিত করে তোলা। আর গরিবেরা, ভুখা-নাঙা মানুষেরা যদি প্রশ্ন তোলে — "তবে কি আমাদের আর মুক্তি নেই" — তখন পরিত্রাতা হিসাবে সামনে হাজির করানো হয় বিশিষ্ট সাধু-সন্ত-পির-ফকির-দরবেশ-বাবা ঠাকুর-মা জননীদের। যত তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গল্প গাথা বানানো যাবে, ততই তাঁদের পরিত্রাতা-ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

মাদার টেরিজা হয়তো সদিচ্ছা নিয়েই খ্রিস্টীয় মানবপ্রেমের মন্ত্র মূলধন করে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের অমোঘ নিয়মে কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু বিবস্ত্র মানুষ। এখানে মানবসেবার অফুরন্ত সুযোগ। এখানে সেবিকা পরিত্রাতা হওয়ার বিরাট অবকাশ। আর এই ভাবমূর্তির মূল্য তো অনুন্নত ভারতের মাটিতেই নয়, উন্নত সমৃদ্ধ পশ্চিমী দেশগুলিতেও এর ব্যাপক চাহিদা। তাই হেনরি কিসিংগার, মিখাইল গর্বাচেভের মতোই বিশ্বশান্তি রক্ষায় শূন্য অবদানের জন্য মাদার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে পরিত্রাতা ভাবমূর্তি অর্জনে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যান। সেই ধারাবাহিকতাতেই আজ তাঁর মরণোত্তর সন্ত পদে অভিষেক হচ্ছে। এর জন্য সাধারণত মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর অন্তত অপেক্ষা করার যে অলিখিত নিয়ম ছিল তাকেও অগ্রাহ্য করে মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই তাঁকে এই মর্যাদা দিয়েছে ভ্যাটিক্যান।

এর পেছনে যে মিথ্যাচার রয়েছে তাকে শুধু মিথ্যা বলে চিনলেই হবে না। ভারতের তথা সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে, কেন এই মিথ্যাচার, কাদের স্বার্থে। নিজেদের শোষণমুক্তির রাস্তা খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজনেই এই বিশ্লেষণ তাদের করতে হবে।

সোনারপুরে জলবন্দী মানুষের দুর্দশায় প্রশাসনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জল নিষ্কাশনের ও জলবন্দী মানুষের ত্রাণের দাবিতে গত ১৩ অক্টোবর সোনারপুর বিডিও অফিসে এস ইউ সি আই - সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কচুরিপানা সহ জল সরানোর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিডিও কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় এলাকার জলবন্দী মানুষদের নিয়ে গত ২১ অক্টোবর ২০ জনের একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটির পক্ষ থেকে আগামী ২৮ অক্টোবর এলাকার ব্যাপক মানুষকে সংগঠিত করে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ সহ বিডিও অভিযানের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

এগরায় আইন অমান্যে পুলিশের আক্রমণ

এগরা বন্‌ধ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার দুবদা অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও দুবদা বেসিন সংস্কারের দাবিতে ২২ অক্টোবর দুবদা বেসিন সংস্কার কমিটির নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলার এগরা এস ডি ও অফিসে আইনঅমান্য হয়। আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে এবং ৭৪ বছরের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী মতিলাল প্রধান সহ ৩৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের লাঠিচার্জে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ডি এস ও নেতা সত্যেন দাস ও অশোক বাড়িকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঐ দুজনকেই কলকাতায় এস এস কে এমে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশের নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ধৃতদের মুক্তি এবং অবিলম্বে দুবদা বেসিন সংস্কারের দাবিতে ২৫ অক্টোবর দুবদা বেসিন সংস্কার কমিটির ডাকে এগরা থানায় জনগণ সর্বাত্মক বন্‌ধ পালন করেছেন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১০ সংখ্যা

মহিলাদের গ্রেপ্তারে মহিলা পুলিশের প্রয়োজন নেই

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে কেরালায় বিক্ষোভ

মহিলাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের হাতে বল্গাহীন ক্ষমতা তুলে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এ আই এম এস এস) তার তীব্র বিরোধিতা করেছে।

এই রায়ের বিরুদ্ধে এ আই এম এস এসের কেরালা রাজ্য সংগঠন ২৩ অক্টোবর কেরালা হাইকোর্ট অভিযান করে। বিক্ষোভ অভিযানের শুরুতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শীলা কে জন বলেন — মহিলাদের রাতেও গ্রেপ্তার করা যাবে এবং পুরুষ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে — এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টের রায় স্বাভাবিক ন্যায়ের পরিপন্থী শুধু নয়, আমাদের সংস্কৃতির উপরও আক্রমণ। তিনি বলেন, নারীদের সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসন এদেশে যে জঘন্য আচরণ করে, সেই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখে এই রায় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইন থাকা সত্ত্বেও উর্দিপরা রক্ষকদের হাতে নারীর নিরাপত্তা ও ইজ্জত যেখানে বিপন্ন হচ্ছে সেখানে এই রায় পুলিশ-প্রশাসনকে নারীর উপর আরও বেপরোয়া আক্রমণের সুযোগ করে দেবে।

এস ইউ সি আই কেরালা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল এ প্রসঙ্গে বলেন — এটি কেবল মহিলাদের সমস্যা নয়, গোটা সমাজেরই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

বিক্ষোভ অভিযানে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ সৌভাগ্য কুমারী, এম এ বিন্দু, কে কে শোভা, সুসি এম এ, এস রাধামণি, এবং কে কে শীলা। কোর্টের সন্নিকটে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ আই এম এস এসের কেরালা রাজ্য সংগঠন ২৩ অক্টোবর কেরালা হাইকোর্ট অভিযান

তর্জন গর্জন শেষ

একের পাতার পর

অনুসরণ করেই সি পি এম ফ্রন্ট সরকার মিটিং-মিছিলে নিয়ন্ত্রণের বিধান রচনা করেছে।

তাহলে বিচারপতির বিরুদ্ধে সি পি এম নেতারা অত তর্জন-গর্জন করেছিলেন কেন? সেটাও আসলে জনগণকে ঠকাতেই। সি পি এম নেতৃত্বের এই দ্বিচারিতা তখনই এস ইউ সি আই উদঘাটিত করে দিয়ে বলেছিল যে, বাইরে 'রণং দেহি' ভাব দেখানো, বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা, কটু মন্তব্য করে হৈ চৈ ফেলে দেওয়া ইত্যাদি সবেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দলের কর্মীদের ও জনগণের সামনে লড়াকু ভাব দেখিয়ে হাইকোর্টের রায়ের মূল ইস্যুকে পিছনে ঠেলে দেওয়া, এবং শেষপর্যন্ত রায়ের সুযোগ নিয়ে সরকারকে দিয়েই মিটিং-মিছিলের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা — যে পরিকল্পনাটি তারা আগেই নিয়ে রেখেছেন।

এস ইউ সি আই জনস্বার্থবিরোধী এই রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছিল। কারণ, মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার নামে বাস্তবে ঐ রায় গণআন্দোলনের উপর এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। দেশের মালিকশ্রেণী যেমন, তেমনি সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও এখন কংগ্রেস, বিজেপি পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সরকারের মতোই গণআন্দোলনকে ভয় পায়। তাই মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য আদালতের রায় সি পি এম-এর কাছে আশীর্বাদের মতোই এসেছে। আমরা বলি, মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার আগে, সাহস থাকলে যে কারণে মানুষ মিটিং-মিছিল করতে বাধ্য হয় সেই মালিকদের অন্যায় ছাঁটাই, ন্যায্য মজুরি না দেওয়া, পি এফের টাকা আত্মসাৎ করা, অসাধু ব্যবসায়ীদের চাষীদের ফসলের উচিত মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি প্রভৃতি হাজারো রকমের অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি ও কার্যকরী করুন। তাহলে বোঝা যাবে, সরকারের হিম্মত কতখানি এবং সরকার আসলে কার স্বার্থ রক্ষা করতে চায় — জনগণের, না মালিকশ্রেণীর !

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে

সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন

বি সি রায় শিশু হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও মুর্শিদাবাদে বহুসংখ্যক শিশুর মৃত্যু, ক্রিকেটার রজনীশ প্যাটেল ও স্টাফ নার্স তৃপ্তি বিশ্বাসের মর্মান্তিক মৃত্যুর মত সাবিনা-সুস্মিতার মৃত্যুও এ রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল চিত্রটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারীকরণ নীতির ফলে হাসপাতালে দফায় দফায় চার্জ বাড়িয়ে, সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চার্জ বসিয়ে, ফ্রি-বেড কমিয়ে হাসপাতালগুলোকে বেসরকারি নার্সিংহোমে পরিণত করা হচ্ছে, যার ফলে গরিব মানুষ টাকার অভাবে হাসপাতালের দরজা থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক গাফিলতি, দুর্নীতি ও দালালচক্রের দাপট বেড়েই চলেছে। হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইনের বোতল সরবরাহ করা হচ্ছে।

এর প্রতিবাদে গত ২১ অক্টোবর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে 'সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয় এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আমেরিকা, ফ্রান্স, সিরিয়া, তুরস্ক, কিউবা, আলজিরিয়া, মরিশাস, প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, নেপাল, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগ দেবেন

মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবসে

জনসভা

১৭ নভেম্বর, ২০০৩

মহাজাতি সদন, কলকাতা

প্রধান বক্তা ঃ

কমরেড নীহার মুখার্জী

এস ইউ সি আই-এর পক্ষে মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net